২৩

কারাবন্দিদের অধিকার

জন অসিত দাস

কারাগারে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা থেকে বাংলাদেশ এখনও অনেক দূরে রয়েছে। এমনকি সংস্কারের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সাধারণ কারাবন্দিদের অবস্থার ক্ষেত্রে সামান্যই উন্নতি সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে, অন্যান্য বারের চেয়ে এ বছর বেশিসংখ্যক কারাবন্দি, যারা কিনা সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন, প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে।

'মুক্তজীবনের সুযোগবঞ্চিত এমন সব ব্যক্তির প্রতি, মানুষের জন্মগতভাবে প্রাপ্য মর্যাদার কারণে– মানবিক ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে'[১] বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। তাছাড়া নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের (আইসিসিপিআর) আওতায় বিচারাধীন ব্যক্তিদের সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের থেকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দিদের প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে, বন্দিদের যথাসম্ভব দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করতে এবং হেফাজতে বা বন্দি থাকা সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কারাবন্দিদের প্রতি আচরণ বিষয়ক জাতিসংঘের ন্যূনতম মানসম্মত আচরণ-বিধিতে (দি ইউএন স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস্ ফর ট্রিটমেন্ট অব প্রিজনার্স),

---

১ আইসিসিপিআর (ইন্টারন্যানাল কাভনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস)।

কারাবন্দিদের প্রতি যথাযথ আচরণ ও কারা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ দিকনির্দেশনা মোতাবেক কারাবন্দিদের জীবনের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বন্দিদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বন্দিদের কারামুক্তি-পরবর্তী স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি করা ইত্যাদি মৌলিক নীতিগুলো পালন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অধিকন্তু কারাগারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত তথ্য জানার অধিকার, ধর্ম বিশ্বাস বিষয়ক অধিকার, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার এবং অসুস্থতাজনিত কোনো মৃত্যুর ঘটনা সেই বন্দির পরিবারকে জানানো ইত্যাদির বিষয়ে বন্দিদের অধিকারের প্রতি কারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে কারাবন্দিদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনগুলো হলো– ১৮৯৪ সালের কারা আইন, এর সাথে সম্পর্কিত বিধি এবং নিজস্বভাবে প্রণীত পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশনাবলি; যেগুলো একত্র করে প্রণীত হয়েছে ১৯২০ সালের কারাবিধি, ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৪ সালের ভবঘুরে আইন এবং ১৯৭৪ সালের শিশু আইন। এসব আইন কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক সনদ ও কারাবন্দিদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত ন্যূনতম আচরণবিধির সাথে বিরোধপূর্ণ। যেমন– বর্তমান কারাবিধিতে ধনী ও ক্ষমতাবান বন্দিরা আদালত কর্তৃক তাদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় 'বিশেষ সুবিধাভোগ বা ডিভিশন' পাওয়ার অধিকারী। এখানে অন্য বন্দিদের সাথে নির্বিচারে এবং বৈষম্যমূলকভাবে শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে।

খসড়া কারাবিধি

২০০৮ সালের ইতিবাচক উন্নয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক খসড়া কারাবিধির অনুমোদন। ঔপনিবেশিক সময়ে প্রণীত কারা আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন করে কারা বিষয়ক বিশেষ কমিটি কর্তৃক এই খসড়া বিধিটি প্রস্তাব করা হয়। নতুন বিধিতে যেসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে আছে– 'উন্মুক্ত কারাগার' ও 'ক্যাম্প কারাগার' স্থাপনের সুযোগ, 'কারাবন্দিদের মর্যাদা বা ডিভিশন দেয়া এবং তা বাতিল করার ক্ষমতা কারা প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত করা (ইতোপূর্বে শুধু আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হতো) এবং কারাবন্দিদের জন্য কারাগারের ভেতরে পৃথক রান্নাঘর ও শৌচাগার সুবিধার ব্যবস্থা।[2] তাছাড়া

২ *ইত্তেফাক*, ১৪ জুন ২০০৮।

কারাবন্দিদের প্যারোলে মুক্তি দেয়া, কারাগারের ভেতরে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের স্বাধীনতা, বন্দিদের জন্য বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, শ্রেণী ডিভিশন সুবিধার প্রক্রিয়া সহজকরণ এবং বন্দিদের জন্য খাবার বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্যে দূর করার বিষয়গুলোও নতুন কারাবিধিতে রয়েছে। কঠোর শ্রমযুক্ত কারাবাসও নতুন জেলবিধিতে রহিত করা হয়েছে।

ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি

বাংলাদেশের কারাগারগুলোর একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা এবং কারাগারগুলোর দুরবস্থার একটি অন্যতম কারণ হলো ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্তসংখ্যক বন্দির অব্যাহতভাবে কারাগারে অবস্থান। ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে দেশের কারাগারগুলোতে মোট বন্দির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮ হাজার, যেখানে কারাগারের মোট ধারণ ক্ষমতা ২৬ হাজার।[৩] এ বছরের জুন মাসে যখন কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭,৩৬৮ জন, তখন কারাবন্দিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬ হাজার জনে ছাড়িয়ে যায়।[৪] ঘুমানোর স্থান সঙ্কটের কারণে বন্দিদের, এমনকি নারী বন্দিদের পর্যন্ত সময় ভাগ করে পালাক্রমে ঘুমাতে হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতা ২,৬৪২ জনের স্থলে তিনগুণের বেশি, প্রায় দশ হাজার বন্দি রয়েছে।[৫] চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ১,৫০৭ জনের ধারণক্ষমতার বিপরীতে চারগুণ অর্থাৎ ৬,৪৬৮ জন বন্দি রয়েছে।[৬] 'গণগ্রেফতারের' সময়ে কারাগারের সাধারণভাবে থাকা ক্ষমতাতিরিক্ত বন্দি সংখ্যার মাত্রা আরো ব্যাপকতর হয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-এর ২৮ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১,৬৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়, ২০০৭ সালের মে-জুনে এ সংখ্যা ছিল ১,২৯১।[৭] অব্যাহতভাবে বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং খাদ্য, স্থান ও সুবিধাদির সঙ্কট কারা প্রশাসনের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, কারাগারে দুর্নীতি

---

৩ আসক, *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৭*, আসক, ঢাকা, ২০০৮।

৪ *ইনকিলাব*, ২৬ জুন ২০০৮।

৫ 'সরডিনড ইনটু প্রিজনস', *দি ডেইলি স্টার*, ২৬ জুলাই ২০০৮।

৬ *নয়া দিগন্ত*, ২ মার্চ ২০০৮।

৭ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের কারাগার : ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই – ছোট সে তরী', *ইনকিলাব*, ২৬ জুন ২০০৮।

নিয়ন্ত্রণের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে কমপক্ষে ১৩০ জন কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক (চাকরিচ্যুতি) ব্যবস্থা নিয়েছে।[৮]

সারণি ২৩.১: কারাগারে অতিরিক্ত বন্দি (জানুয়ারী ২০০১ - জানুয়ারী ২০০৮)[৯]

মাস/বছর	ধারণক্ষমতা	বন্দিসংখ্যা
জানুয়ারি ২০০১	২৩,৯৪২	৬০,৮৮৭
জানুয়ারি ২০০২	২৪,৯৯৭	৬২,৪৮৬
জানুয়ারি ২০০৩	২৫,০১৮	৭৫,১৩৫
জানুয়ারি ২০০৪	২৫,৩৯৬	৬৯,৫১৯
জানুয়ারি ২০০৫	২৬,১৫৭	৭৪,৭১০
জানুয়ারি ২০০৬	২৭,১১২	৭২,৮৩৬
জানুয়ারি ২০০৭	২৭,২৫৪	৬৮,২৭৮
মে ২০০৭	২৭,২৫৪	৮৫,৯৪১
জুলাই ২০০৮	২৭,৪৫১	৮৭,০১১

কারাগারে বিদেশি বন্দি

ইতোমধ্যে দণ্ডাদেশ ভোগ সমাপ্ত হয়েছে এমন বন্দিসহ কয়েকশ’ বিদেশি বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটকে আছে; এদের মধ্যে অন্তত ৪৩৪ জন মায়ানমারের, প্রায় ৪০০ জন ভারতের এবং অন্যরা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও সৌদি আরবের নাগরিক।[১০] এদের মধ্যে একশ’রও বেশি মায়ানমারের নাগরিক, তাদের দণ্ডভোগের পর ৯-১০ বছরেও বেশি সময় কারাগারে বন্দি রয়েছে। তাদের কোনো বৈধ পাসপোর্ট না থাকা এবং মায়ানমার সরকার তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করার কারণে তারা কারাগারে আটক আছেন।

নারী বন্দি

৭ আগস্ট ২০০৮ *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে অন্তত ৩,৪৮০ জন নারী অবস্থান করছে। কারাবিধিতে নারীদের পুরুষ থেকে পৃথকভাবে রাখার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও জানা গেছে একজন বিচারাধীন নারী বন্দি কারাগারে গর্ভবর্তী হয়েছে এবং এ বছরের

৮ *ইত্তেফাক*, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৯ ‘সরডিনড ইনটু প্রিজনস’, *দি ডেইলি স্টার*, ২৬ জুলাই ২০০৮।

১০ *যুগান্তর*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২১ অক্টোবর একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে।[11] পরবর্তীকালে কারা কর্তৃপক্ষ একজন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে এবং সে এ ঘটনার জন্য দায়ী বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এ বছরে নারীদের জন্য তৈরি একমাত্র কারাগারটি, যা গত ২০০৭-এ নির্মিত হয় সেটি চালু হয় এবং অত্যধিক বন্দি ভাড়াক্রান্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নারী বন্দিদের সেখানে স্থানান্তর করা হয়।

শিশু বন্দি

কারাগারগুলো থেকে যে কোনো শিশু ও কিশোর বন্দিদের সংশোধনাগারে প্রেরণ করার বিষয়ে ২০০৩ সালে উচ্চ আদালতের দেয়া আদেশ পাঁচ বছর পরেও কার্যকর হয়নি। ফলে কমপক্ষে ৩৮৭ জন শিশু ও কিশোর অপরাধী দেশের বিভিন্ন কারাগারে অবস্থান করছে[12]

প্রকাশিত বিভিন্ন অনিয়মের খবর

বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে আটক সাবেক রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে মোবাইল ফোনের অবৈধ ব্যবহার সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে একাধিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। মওদুদ আহমদ, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মোসাদ্দেক হোসেন ফালু, লুৎফুজ্জামান বাবর, মির্জা আব্বাস, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, নাজমুল হুদা, ওয়াদুদ ভুঁইয়া, খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, নাসির উদ্দিন পিন্টু, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (এরা সবাই বিএনপির) এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাসহ বেশ কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষ এ ধরনের নামিদামি বেশ কয়েকজন বন্দির কাছ থেকে অন্তত পনেরোটি মোবাইল ফোন ও একটি 'আইপড' উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করেছে।

জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির দু'নেতার সাথে ২৮ আগস্ট খালেদা জিয়ার কারাগারে তিন ঘণ্টার সাক্ষাতের ঘটনাও পত্রিকায় এসেছে[13] এবং এ ঘটনাটি কারাবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে অফিসিয়াল তদন্তের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়নি। অনুরূপভাবে, বিএনপির ২০-২৫ জন সদস্য মানিকগঞ্জ কারাগারে মুজিবুর রহমান সরোয়ারের (বরিশালের সিটি

---

১১ *সমকাল*, ২৮ অক্টোবর ২০০৮।

১২ 'ইমপ্রুভ কোয়ালিটি অব কেয়ার ফর অ্যাবানডানড চিলড্রেন', *দি ডেইলি স্টার*, ৩১ আগস্ট ২০০৮।

১৩ *যুগান্তর*, ৯ অক্টোবর ২০০৮।

করপোরেশনের মেয়র) সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় মিলিত হওয়ার একটি ঘটনার সময়ও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বাধানিষেধের সম্মুখীন হয়নি বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।[১৪] কারাবন্দিরা যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক বিবৃতি দেয়া থেকে বিরত থাকবেন– কারা উপমহাপরিদর্শকের এ ধরনের বিবৃতির পরে উপরোক্ত মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।[১৫]

১৫ মে ২০০৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার থেকে সাজাপ্রাপ্ত চারজন বন্দি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কারাগারের নিরাপত্তা ত্রুটি খতিয়ে দেখতে দু'সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা যায়নি।[১৬]

কারাগারে চিকিৎসা সুবিধা

বিগত কয়েক বছরে কারাগারের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে কোনো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বা কারাগারের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সুবিধা উন্নত করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কারা উপ-মহাপরিদর্শকের মতে, 'সাধারণ কারাবন্দিরাই শুধু নয়, কারাগারের প্রত্যেকেই চিকিৎসকের অভাব এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধার সঙ্কটে ভোগান্তি পোহাচ্ছে।'[১৭] প্রকাশিত তথ্যানুসারে, দেশের সব কারাগারে থাকা প্রায় ৯০ হাজার বন্দিকে দেখার জন্য ৭৭টি পদের বিপরীতে মাত্র ১৬ জন ডাক্তার আছেন। শুধু ১২টি কারাগারে হাসপাতাল সুবিধা আছে এবং বাকি কারাগারগুলোতে কোনো স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা নেই; এমনকি বিদ্যমান হাসপাতালগুলোর কোনোটিতেই অ্যাম্বুলেন্স নেই জরুরি মুহূর্তে রোগী পরিবহনের জন্য। সাধারণত এ হাসপাতালগুলোর সিট ধনী ও প্রভাবশালী কারাবন্দিদের দখলে থাকে। ফলে অন্য বন্দিরা মারাত্মক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বা নামিদামি বন্দিরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার ও সুবিধা পেয়ে থাকে। এমনকি কারাগারের বাইরে সরকারি হাসপাতালগুলোর বন্দিদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা সেলগুলোর বেডগুলোও তারা দখল করে রেখেছে।[১৮] বিএনপিদলীয় সাবেক স্বরাষ্ট্র বিষয়ক

---

১৪ 'কারাগারে বৈঠকের রহস্য উন্মোচন শিগগির', *সমকাল*, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৫ *ইনকিলাব*, ২৪ এপ্রিল ২০০৮।

১৬ কৈলাশ সরকার, 'নেগলেক্ট অব ডিউটি, পুওর বিএলডিজি কন্ট্রাকশন ব্লেমড কনট্রাকশন ফর জেলব্রেক', *দি ডেইলি স্টার*, ১৭ মে ২০০৮।

১৭ 'সিক ইনম্যাটস সাফার এ্যাজ জেল লেক ডকস', *দি ডেইলি স্টার*, ১১ মে ২০০৮।

১৮ কৈলাশ সরকার, 'হসপিটাল হসপিটালিটি ফর 'ভিআইপি প্রিজনারস', বাবর স্পেন্ডস হায়েস্ট ১৬ আউট অব ১৭ মান্থস ইন হসপিটাল', *দি ডেইলি স্টার*, ২০ অক্টোবর ২০০৮।

প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের একটি অস্ত্র মামলায় ১৭ বছরের কারাবাসের শাস্তি (পরবর্তীকালে ডিসেম্বরে জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত) হলেও, ১৯ মাস কারাবাসের মধ্যে ১৮ মাসই তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল হাসপাতালের বিশেষ সেলে ছিলেন।[১৯] তার মতো ২০০৭-এর ১১ জানুয়ারি আটক হওয়া এবং পরবর্তীকালে জামিন বা প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত দেড় শতাধিক নামিদামি ব্যক্তির অনেকেই কারা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের আটকাবস্থায় অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দুই ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো, খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা (সাংসদ) সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, বিএনপিদলীয় সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, মির্জা আব্বাস, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, নাজমুল হুদা, খোন্দকার মোশাররফ হোসেন ও মওদুদ আহমদ, সাবেক উপ-মন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং মীর নাছির উদ্দিন, বিএনপিদলীয় সাবেক সাংসদ নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু, হাফিজ ইব্রাহিম, আলী আসগার লবী, মনজুরুল আহসান মুন্সি, ওয়াদুদ ভুঁইয়া, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র (আওয়ামী লীগ নেতা) এবিএম মহিউদ্দিন, দৈনিক জনকণ্ঠের প্রকাশক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ ও আরো অনেকে। আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক মন্ত্রী আবদুল জলিলও এদের মধ্যে রয়েছেন; যারা হাসপাতালের বিছানায় তাঁদের কারাবাসের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। কারা মহাপরিদর্শকের বক্তব্য মতে, ‘অসুস্থ নামিদামি বন্দিদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার এবং যত দিন সম্ভব সেখানে থাকার একটি মানসিকতা আছে। এটাও দেখা গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বিভিন্ন বানানো কারণ ও অজুহাত দেখিয়ে তাদের হাসপাতালে থাকার সময় বাড়িয়েছেন।’[২০]

কারাগারে মৃত্যু

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের কারাগারে বা কারা হাসপাতালে ৬১ জন কারাবন্দির মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৭ জন ছিলেন বিচারাধীন ব্যক্তি। কারা কর্তৃপক্ষের মতে, তাদের অনেকেই অসুস্থতার কারণে মারা গেছে। এটাও জানানো হয়েছে যে, অন্তত ৪৯ জন বন্দি

---

১৯ *প্রাগুক্ত।*
২০ *প্রাগুক্ত।*

মারাত্মক আঘাত ও ক্ষত নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে ভর্তি হয়; কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় জরুরি চিকিৎসা সেবা তারা পায়নি।[২১]

বিভিন্ন কারণে মৃত্যুর ঘটনা ছাড়াও এ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তিকে কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে এবং অপর একজন ব্যক্তি (যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা) যার ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল, সেনাপ্রধানের ব্যক্তিগত অনুরোধে ফাঁসি কার্যকর করার নির্ধারিত সময়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে প্রেসিডেন্ট তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করেন।

ইতিবাচক অগ্রগতি

কারাগার পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এ বছর যে উদ্যোগ নিয়েছে তার মধ্যে ছিল কারা পুনর্নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ এবং ৩৪টি কারাগার নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া। সরকার আরো কিছু ক্ষেত্রে কারাগারের অবস্থা উন্নয়নের বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে। যেমন– মৌলভীবাজার কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষ কারাবন্দিদের জন্য উপার্জনমূলক কার্যক্রম, দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বলে জানা গেছে।[২২] ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬টি নিটিং মেশিন নিয়ে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়েছে। কারাবন্দিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ ফ্যাক্টরি গত ৩ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয়।[২৩]

---

২১ *যুগান্তর*, ৪ জুলাই ২০০৮।

২২ 'মৌলভীবাজার জেল টার্নস ইনটু এ রেক্টিফিকেশন সেন্টার', *নিউ এজ*, ১০ এপ্রিল ২০০৮।

২৩ 'ফ্যাক্টরি ওপেনস ইনসাইড ঢাকা জেল টু রিহ্যাবিলেটেড প্রিজনার্স', *দি ডেইলি স্টার*, ৪ নভেম্বর ২০০৮।